চলে গেলেন দেশপ্রেমিক চিকিৎসক
এ কে এম রফিক উদ্দিন

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

২৯ এপ্রিল, ২০১৩। দিনটি আমাদের জন্য যুগপৎভাবে দু'টি মর্মান্তিক দুঃসংবাদের দিন। ওই দিনটিতে দেশবাসী যখন বাংলাদেশের ইতিহাসের ভয়াবহতম ভবন ধস তথা রানা প্লাজা ধসের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার উদ্ধার কাজ প্রত্যক্ষ করছিল, যে দিনটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজে রানা প্লাজা ধসের নিহত-আহত পোশাক শ্রমিকদের শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাচ্ছিলেন, ঠিক সেই দিনটিতে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো জানতে পারলাম, কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদনা উপদেষ্টা ও আমার মেঝো ভাই অধ্যাপক ডা. আবুল খায়ের মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন প্রাণঘাতী অ্যাড্রেনাল কার্সিনোমা নামে ক্যান্সারে আক্রান্ত। এ খবরটি ছিল আমাদের গোটা পরিবার ও স্বজনদের জন্য এক বজ্রাঘাতের মতো। এ ধরনের ক্যান্সার সাধারণত দেখা যায় না। কোটিতে ৪-৫ জনের এ ক্যান্সার হতে দেখা যায়। আর এই প্রাণঘাতী ক্যান্সারের কারণেই গত ১৯ অক্টোবর, ২০১৩ শুক্রবার তাকে চিরদিনের জন্য এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হলো না ফেরার দেশে।

অধ্যাপক ডা. আবুল খায়ের মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন এ দেশের প্রথম সারির একজন চিকিৎসক। কর্মজীবনে নিবেদিতপ্রাণ এ চিকিৎসককে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। দায়িত্ব পালন করেছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে। শেষ জীবনে ছিলেন এনাম মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেস ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি।

অ্যাড্রেনাল কার্সিনোমা নামের ক্যান্সার শনাক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ২ অক্টোবর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকার পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি ১৯ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলায়হি রাজিউন– আমরা আল্লাহর এবং ফিরে যাব আল্লাহর কাছেই)। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। এত আগে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, তা ছিল অনেকটাই অকল্পনীয়। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী অধ্যাপক ডা. রোকেয়া বেগম, এনাম মেডিক্যাল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক; ছেলে ডা. সালেহ উদ্দিন মাহমুদ, লন্ডনে স্পোর্টস মেডিসিনের ওপর পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত; পুত্রবধূ ডা. তামান্না রহমান, লন্ডনে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত; মেয়ে ডা. সামিয়া মাহমুদ, প্রভাষক, আনোয়ার মোহাম্মদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং মেয়েজামাই ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ইশতিয়াক আহমেদসহ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে যেনো এ শোক বইবার ক্ষমতা দেন।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের একজন ছিলেন অধ্যাপক ডা. আবুল খায়ের মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন। দেশের যে কয়জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নানাভাবে আমাদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবদান রেখে গেছেন, নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন তিনি। একজন চিকিৎসক হিসেবে অধ্যাপক ডা. আবুল খায়ের মোহাম্মদ রফিক উদ্দিনের জীবনের বিশেষ দিক হলো প্রচণ্ড দেশপ্রেমবোধ। প্রচণ্ড দেশাত্মবোধের কারণে বিভিন্ন সময়ে মোট নয়বার বিদেশে কর্মস্থল বেছে নেয়ার প্রস্তাব পেয়েও তিনি দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে রাজি হননি। তিনি একজন চিকিৎসক হিসেবে উচ্চতর প্রশিক্ষণ অথবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে গেছেন, কিন্তু দেশের মানুষকে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করে শুধু বিত্তবৈভবের লোভে উচ্চ বেতনে বিদেশে চাকরির পথ বেছে নেননি। নিরন্তর মাটির কাছে থাকাতেই ছিল তার অপার সন্তুষ্টি।

তিনি কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশক নাজমা কাদের ও সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদের মেঝো ভাই এবং কারিগরি সম্পাদক আবদুল ওয়াহেদ তমালের মেঝো মামা। তাকে কমপিউটার জগৎ-এর কার্যালয়ে কখনও দেখা যায়নি ঠিকই, তবে প্রকাশক নাজমা কাদের পত্রিকা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতেন তার কাছে থেকে। বিশেষ করে কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদেরের অবর্তমানে ডা. রফিক উদ্দিনই যেনো হয়ে উঠেছিলেন কমপিউটার জগৎ-এর অন্যতম অভিভাবক। নেপথ্যে থেকে কমপিউটার জগৎ সম্পর্কিত তার মূল্যবান পরামর্শ ছিল খুবই গুরুত্ববহ। তাকে হারিয়ে কমপিউটার জগৎ যেনো হারালো তার অন্যতম এক সুপরামর্শক অভিভাবককে।

পরিবারে ছিলেন ঐক্যের প্রতীক

তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি, ঐক্যের প্রতীক। ১৯৮৩ সালে মা এবং ১৯৮৯ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই ১০ ভাইবোনের পরিবারকে এক ছাতার নিচে ধরে রাখতে পারার সমূহ কৃতিত্বের দাবিদার তিনি। কখনই আমাদেরকে তিনি বাবা-মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। বাবার শতভাগ অভাব পূরণের ভূমিকা পালন করে গেছেন যথাযথভাবে। আমাদের পরিবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যেকোনো কাজ করার আগে অবশ্যই সবার মতামত নিতেন। কখনই তার একান্ত নিজস্ব মতামত অপরের ওপরে চাপিয়ে দিতেন না। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের বড় ভাই ব্যারিস্টার এ কে এম শফিউদ্দিনের ওপর ছিল তার প্রচণ্ড শ্রদ্ধাবোধ। তিনি কখনও বড় ভাইকে না জানিয়ে কোনো কিছু করতেন না। বড় ভাইও ছিলেন মেঝো ভাই রফিক উদ্দিনের ওপর বেশ আস্থাবান। তাই বড় ভাইয়ের সব

(বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়)

ধরনের কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল মেঝো ভাইয়ের ওপর। কারণ তার বিশ্বাস ছিল মেঝো ভাই অযৌক্তিক কিছু করবেন না।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, আর্থিক বা চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছাড়াও অন্য যেকোনো ধরনের বিপদে-আপদে তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের রক্ষাকবচ। আমাদের এ বিশাল পরিবারের বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য তিনি ভাইবোনদের সাথে ঈদ বা অন্যান্য ছুটির দিনে একত্রে কাটানোর জন্য একান্ত নিজস্ব পরিমণ্ডলের সামাজিকতাকে এড়িয়ে রাজশাহী বা ধানমণ্ডি থেকে চলে আসতেন নিজ পিতৃভূমি মিরপুরে। সাধারণত বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে আজকের দিনের পরিবারগুলোতে এমনটি খুব একটা দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, অন্যান্য ভাইবোন যারা মিরপুরে থাকতেন না, তাদেরকেও মিরপুরে আসার জন্য বলতেন। অনেক সময় বাধ্য করতেন, যা মূলত পারিবারিক বন্ধনকে শুধু দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরই করেনি, বরং তা আমাদের পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের সহযোগিতামূলক মনমানসিকতা গড়ে তোলায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। একথা সত্য, পারিবারিক বন্ধনকে অটুট বা সুদৃঢ় করার জন্য আত্মত্যাগের যে কোনো বিকল্প নেই, থাকতে পারে না– তা তিনি আমাদেরকে তার কাজের মধ্য দিয়ে শিখিয়েছেন, দেখিয়েছেন ও বুঝিয়েছেন। মরহুম অধ্যাপক ডা. আবুল খায়ের মোহাম্মদ রফিক উদ্দিনের মধ্যে হোম সিকনেস এত প্রখর ছিল যে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে যখন তিনি শয্যাশায়ী, তখনও আমাদেরকে আগের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ জানিয়ে গেছেন।

জীবনপাতা

মরহুম অধ্যাপক ডা. আবুল খায়ের মোহাম্মদ রফিক উদ্দিনের জন্ম ১৯৪৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জনস থেকে ইন্টারন্যাল মেডিসিনে এফসিপিএস ডিগ্রি নেন। এছাড়া তিনি এফএসি ডিগ্রি অর্জন করেন। এফসিপিএস পাস করার পর তিনি রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে কন্সালট্যান্ট হিসেবে যোগ দেন। এরপর ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সাল এই ৫ বছর ছিলেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক এবং ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৮ সাল এই ১১ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন ইউনিটের প্রধান হিসেবে তিনি কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৭ সাল এই ১০ বছর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থেকে সরকারি চাকরির ইতি টানেন। এরপর এনাম মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন।

অধ্যাপক রফিক উদ্দিন একজন শিক্ষক হিসেবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ফেলো রেসিডেন্ট ও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের উদ্দেশে অসংখ্য লেকচার, ক্লিনিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন, টিউটোরিয়াল দিয়েছেন। এমবিবিএস ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমাসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মেডিক্যাল পরীক্ষার একজন পরীক্ষক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। সাধারণ মানুষকে চিকিৎসাসেবা দেয়া এবং চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি চিকিৎসা বিষয়ে লেখক-গবেষক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তার প্রকাশনার সংখ্যা শতাধিক। তিনি চিকিৎসাবিষয়ক বিভিন্ন জার্নাল সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিনের প্রকাশিত 'জার্নাল অব মেডিসিন'-এর প্রধান সম্পাদকও ছিলেন। দেশের একজন কৃতী সন্তান হিসেবে, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত মেডিসিনের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং বেতারে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচুর অনুষ্ঠানে অংশ নেন। জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাসহ বিভিন্ন ফ্রি মেডিক্যাল ক্লিনিকে সশরীরে উপস্থিত থেকে সরাসরি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিতেন। যে মরণব্যাধি ক্যান্সার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে বেশ তৎপর ছিলেন, তাকেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো সে ক্যান্সারেই।

অধ্যাপক রফিক উদ্দিন শুধু একজন সফল চিকিৎসকই ছিলেন না, ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠকও। তিনি 'বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। বাংলাদেশ সোসাইটি অব রিউম্যাটোলজির সহ-সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডা. রফিক উদ্দিন যেমন ছিলেন খুব বন্ধুপ্রবণ, তেমনই ছিলেন খুব কঠোর নিয়মনিষ্ঠ। তিনি কখনও অন্যায়ের সাথে আপোস করেননি, এমনকি জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও। তাই ১৯৯২-৯৩ সালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের কিছু ছাত্র ভয়ভীতি দেখিয়ে অন্যায়ভাবে পাস করিয়ে দেয়ার দাবির মুখে তিনি মাথা নত করেননি। এমনকি সরকারের ওপর মহলের এবং রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের ভয়ভীতি ও চাপ থাকা সত্ত্বেও তাতে তিনি রাজি হননি। এ ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাকে বেশ কয়েকবার।

উত্তরবঙ্গে অধ্যাপক ডা. রফিক উদ্দিন সুপরিচিত ছিলেন গরিবের ডাক্তার হিসেবে। কেননা, তিনি কখনই অপ্রয়োজনে রোগীদের ওপর বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল টেস্টের বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। তিনি সব সময় মনে করতেন, সুচিকিৎসার জন্য ডাক্তার-রোগী সম্পর্কটি হওয়া উচিত খুবই আন্তরিক ও বন্ধুসুলভ। তাই যখনই কোনো রোগী তার চেম্বারে ঢোকেন, তখন প্রথমে তিনিই রোগীকে সালাম দিতেন। এরপর চিকিৎসা শুরু করতেন। তিনি প্রথমেই রোগীর পারিবারিক স্ট্যাটাস জেনে নেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দিতেন, যাতে করে রোগীর খরচ সহনীয় মাত্রায় থাকে।

ডা. রফিক উদ্দিনকে হারিয়ে আমরা পারিবারিকভাবে যেমন হারালাম পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে, তেমনি জাতি হারালো এক অভিজ্ঞ চিকিৎসককে।

লেখক : অধ্যাপক ডা. এ কে এম রফিক উদ্দিনের ছোট ভাই